১৫৫

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ২0 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

৬৫ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত

পরিবর্তনের হাওয়া গারোদের জীবনযাত্রায়

উজ্জ্বল মেহেদী: সুনামগঞ্জ থেকে : শিক্ষাদীক্ষায় চিরবঞ্চিত সুনামগঞ্জের আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের মাঝে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিমণ্ডল ভেদ করে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। সুনামগঞ্জ সদর থানার রঙ্গারচর ইউনিয়নের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে নারায়ণতলা গ্রামের ৫০০ পরিবারের সন্তান-সন্ততি এখন স্কুলগামী। কেউ কেউ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করছে। দৃশ্যত পালাবদলের ফলে চলমান জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় গারো সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করে আপন ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে আধুনিক জীবনযাত্রার দিকে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী গ্রাম নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায় এ জেলার আদি ও অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী। জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যরা এ দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তাদের সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এই আদিম সম্প্রদায়ই অনার্য পরিচয় লাভ করে। আর্য-অনার্য যুদ্ধে অনার্যরা পরাজিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বন-জঙ্গল, পর্বত-গুহায় আশ্রয়গ্রহণপূর্বক বসতি গড়ে তোলে।

নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায় মূলত তিব্বতের বাসিন্দা ছিল। কালক্রমে এরা বাংলাদেশের খুলনা, নোয়াখালী, বার্মা সীমান্ত অঞ্চল, দুর্গাপুর, নালিতাবাড়ী, খুরমাকান্দা, টাঙ্গাইল, মধুপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহসহ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অস্থায়িভাবে বসবাস করে উপজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যদের শ্যেন দৃষ্টির অগোচরে এরা লোকালয় ছেড়ে গহীন জঙ্গলে চলাচল করার সূত্রে পর্বত, পাহাড় ঘেঁষে বসবাস করতে উৎসাহী ছিল। এদের বসবাসের ফলে গহীন জঙ্গল এখন আবাদি এবং অনেকাংশে সমতল।

নারায়ণতলায় বর্তমানে গারো সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে হাজং, কুচ, বানাই, সারগান জাতের লোক একত্রে বসবাস করছে। স্বাভাবিকভাবে এরা বেশ ঐক্যবদ্ধ এবং অত্যন্ত ভদ্র, অতিথিপরায়ণ ও আইনানুগত নিরীহ নাগরিক। বাঁশ ও কাঠের উঁচু মাচা তৈরি করে বাসগৃহ নির্মাণ তাদের বংশানুক্রমিক রেওয়াজ হলেও এখন বৃহৎ সমাজের মতো এরা বাড়িঘর তৈরি করছে। বসত ঘরের সঙ্গে গরু ও শূকরের খোঁয়াড় এবং বৈঠকখানা থাকছে। নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও

বর্তমানে এঁরা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত। এই ধর্মান্তর সম্পন্ন হয়েছে প্রাকব্রিটিশ আমলেই।

প্রতিটি উপজাতির মধ্যে যেমন আলাদা নিয়ম-কানুনের প্রচলন আছে তেমনি নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায়ের মাঝেও আছে। তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত। এরা সংসার জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতার দ্বারা শাসিত এবং পুরুষরা কোনো সম্পত্তির মালিক হয় না। পুরুষদের বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ স্ত্রীর বাড়ি যায়। জীবন-জীবিকার পাশাপাশি এদের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটা ঐতিহ্য আছে। জমজমাট সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী গারো নারী-পুরুষ বিয়ে-শাদি, বড়দিন এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসের মাঝামাঝিতে উৎসব করে থাকে। এতে তারা নৃত্যগীত ও পচা মদ পান করে আনন্দ করে। এছাড়া জেলা শহরে ফি বছর বিজয় দিবসের (১৬ ডিসেম্বর) সাংস্কৃতিক উৎসবে এরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে দৃষ্টিনন্দন নৃত্যগীত পরিবেশন করে।

গারোরা একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের শাখা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। এই সংগঠনের নাম 'ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' সংক্ষেপে টিডব্লিউএ। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এই শাখা কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শিশির সাংমা। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই কমিটি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে বেগবান করছে।

নারায়ণতলার গারোরা পূর্বে কৃষি, বন্যপশু ও মাছ শিকারকে একমাত্র পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে দিনাতিপাত করলেও বর্তমানে এক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা লক্ষণীয়। আস্তে আস্তে তাদের সমাজে শিক্ষা বিস্তার লাভ করায় অনেকেই পেশা বদল করছে। অর্থাৎ সিংহভাগ লোক এখন পেশাগত দিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে গারো সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য থেকে। আর এ প্রবণতায় শিক্ষার আলো প্রতিটি ঘরেই জ্বলতে শুরু করছে। জানা যায়, নারায়ণতলায় বসবাসরত গারো সম্প্রদায়ের ৫০০টি পরিবারের প্রায় দেড় হাজার লোকের ৬৫ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিরাট অগ্রসরতা সম্পন্ন হয়েছে স্থানীয় অঙ্গনে মিশন হাইস্কুল ও প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সব সময় অস্থানীয় ভাবে। কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তিমূলক কাজ করার মানসিকতা নেই এদের। তাই বলে এরা অন্যায় কখনো সহ্য করে না। [illegible]-এর মুক্তিযুদ্ধে নিজস্ব আবাস ভূমি রক্ষার জন্য গারো সম্প্রদায়ের ৩০/৩৫ জন তরুণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এ তথ্যটি জানালেন স্থানীয় গারো সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির যদু সাংমা।

তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার সূত্রে জানা গেলো, ১৯১৫ সালে প্রথমে তারা নারায়ণতলায় আসে এবং জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। প্রথমদিকে তাদের প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঈর্ষা এবং হীনমন্যতা ছিল বিধায় নানা সময় রোষানলের কবলে পড়তে হয়েছে। বর্তমানে আর এসব নেই। সুন্দর এবং নির্ভেজাল সামাজিক সম্প্রীতি বিদ্যমান। ৭২ বছর বয়সী যদু সাংমা নিজ সম্প্রদায়ের অনেক খুঁটিনাটি দিক তুলে ধরে বলেন, 'বাংলাদেশের সব উপজাতির মধ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। তবে এ পরিবর্তন জাতকে বিসর্জন দেবে না বরং আধুনিক যুগে টিকে থাকার জন্য শক্ত ভিত রচনা করবে।'

সমাজসচেতন যদু সাংমা আরো জানান, আগে গারোরা কৃষি, পশু ও মৎস্য শিকারের পেশায় একচেটিয়াভাবে নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে স্ত্রীরা কৃষিকাজ ও পশুপালনের সার্বিক কাজ সামলাচ্ছে এবং স্বামীদের অন্য পেশায় আর সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায় যে দিন দিন সমাজসচেতন হয়ে উঠছে তার আরেকটি প্রমাণ— এবারের নির্বাচনে নির্ধারিত মহিলা আসনে প্রার্থী হয়েছেন সাংস্কৃতিক সংগঠক শিশির সাংমার স্ত্রী পান্না রাণী সাংমা। পান্না রাণী সগোত্রের ভোটেই জয়লাভ করবেন বলে সকলেই আশাবাদী।

শুধু নারায়ণতলা গ্রামেই গারো সম্প্রদায়ের বাস নয়। জেলার বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারা বাজার, তাহিরপুর ও ছাতক থানার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে গারো এবং সমগোত্ররা বসবাস করছে। নারায়ণতলার গারো সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বেশ বিত্তবান। কারো আছে পাকা বাড়ি, ঘরে টিভি, ভিসিপি প্রভৃতি। এদের জীবনযাত্রায়, আচার-আচরণে, দৈহিক গড়নে এমনকি পরিধেয় বস্ত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় জড়াচ্ছে তারাই খাঁটি বাঙালিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।